Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-III, January 2019, Page No. 50-57
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রবীন্দ্র সংগীত ও ভারতীয় নৃত্য

পার্থ প্রতিম হালদার

গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং অতিথি অধ্যাপক স্বামী বিবেকানন্দ কলেজ

Abstract

Rabindranath Tagore, son of Maharshi Debendranath, was a polific writer of the world. He was a poet, a dramatist, a novelist, a political thinker, a critic, a singer, a painter, an economist. The song 'Jana Gana Mana' is written by Rabindranath Tagore and this song has been accepted as our National anthem. The songs of Rabindranath Tagore are made of Nature, love and personal affair and his dance form is created accordingly. The dance form of Rabindra Nritya is the pure classical based dance. The dance form of Rabindra Nritya is used mainly adapted versions of Bharatnatyam, Manipuri and Kathakali.

আগের মত সময় করে এখন আর প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যাতে রবীন্দ্রসংগীত শোনা হয়ে ওঠে না। কিন্তু যখন কর্মব্যস্ত জীবনে ইঁদুর দৌড়ের প্রতিযোগিতাতে ক্লান্ত, চিন্তা গ্রস্থ হয়ে পড়ি, বসন্ত কেটে যায় খাদ্যের সারির প্রতীক্ষায়, পথ প্রদর্শকদের 'শান্তির ললিত বাণী' ব্যর্থ পরিহাস শোনায় তখন রবীন্দ্রনাথের 'গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি' এবং তখন তাঁর সংগীতের 'সত্যম-শিবম-সুন্দরম' ঐতিহ্যের সমুদ্রে ডুব দিতে ইচ্ছে করে- "এই করেছ ভালো, নিষ্ঠুর/এই করেছ ভালো। এমনি করে হৃদয়ে মোর। তীব্র দহন জ্বালো।" আবার যখন প্রত্যেকের মুখে মুখে রবীন্দ্রনাথের লেখা তথা বাংলা ভাষায় লেখা দুই দেশের দুই জাতীয় সংগীত 'জনগনমন' ও 'আমার সোনার বাংলা' আকাশে বাতাসে ধ্বনিতে হয় তখন বাঙালি হিসেবে যেমন গর্ব বোধ হয় তেমনি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে যেন মানব ধর্মের জয়ধ্বনি শোনা যায়। তাইতো তাঁর গান নরদেবতা বন্দনার গান, দেশপ্রেম তথা 'এই ভারতের মহা মানবের সাগরতীরে' গান বা ভারতীর্থ রূপী পূণ্যতীর্থের গান। শুধু তাই নয়, তাঁর গান প্রকৃতি বা নারীর সৌন্দর্য বর্ণনার গান তথা প্রেমের গান – "একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি/তাই নিয়ে মনে মনে, রচি মম ফাল্গুনি।" বা "কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,/কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক,/মেঘলা দিনে দেখেছিলেন মাঠে। কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ,। ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে,/ মুক্তবেণী পিঠের পরে লোটে,/ কালো? তা সে যতই কালো হোক, /দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।" তাইতো সংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের জীবনের মধ্যে যখন সংগীত বাজে তখন নিজেকে ভুলে যাই... তখন দুঃখ আমাদের অভিভূত করে না, ক্ষতি আমাদের দরিদ্র করে দেয় না...।"[১] কারণ তাঁর গান আমাদেরকে আনন্দ দেয় – "জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ,/ ধন্য হল ধন্য হল মানবজীবন", তাঁর গান আমাদেরকে উদ্যমী করে তোলে- "ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো, প্রভু/ পথে যদি পিছিয়ে পড়ি

কভু"। তাছাড়া তাঁর গান জীবনকে পুণ্য পথে চালিত করার গান- "আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। এ জীবন পুণ্য করো দহন- দানে। ...নিশিদিন আলোক শিখা জ্বলুক গানে।" তাইতো "আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে... কোরো না বিড়ম্বিত তারে।" সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষের মনে প্রাণে, আবেগে, সুখে দুঃখে, পারিবারিক অনুষ্ঠানে, শিল্প কলকারখানাতে, রাস্তা-ঘাটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের বিশুদ্ধ মধুময় শান্তির মুক্ত ধারায় স্রোত 'শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে' ও মানব জীবনটাকে যেন সতেজ সবুজ প্রাণবন্ত করে প্রবাহিত হয়ে চলেছে যুগান্তর কাল ধরে। তাইতো রবীন্দ্র সংগীতের এমন স্বচ্ছ শীতল পানীয় ঝর্ণা ধারার উদ্দেশ্যে বলতে ইচ্ছে হয়- "এসো শ্যামল সুন্দর/ আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা/ বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে/ এসো শ্যামল সুন্দর।"

ভারতীয় নৃত্যের সমৃদ্ধি ও উন্নতিতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনা কেমন ছিল এবং তাঁর সংগীত এই নৃত্য কে কতটা প্রভাবিত করেছে তা একটু আলোচনা করা যেতে পারে। তবে ইংরেজ আমলে দিল্লী আগ্রা লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে রাজ দরবারে এবং কলকাতার জমিদার বাবু সমাজে বন্দিজী নৃত্যের যে ধারা চালু ছিল তা ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী ধ্রুপদী নৃত্য নয়। একমাএ দক্ষিণ ভারতের ভারতনাট্যম ও কথাকলি নৃত্যই ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী ধ্রুপদী নৃত্যের একটি ক্ষীণ ধারা বলে ভাবা যেতে পারে। যাই হোক এই নৃত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষার্ধেই চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছিলেন। নৃত্যের প্রয়োজনীয়তা তার শিল্পসম্পদ, সার্থক প্রয়োগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন।

> *"Rabindra Nritya, the most recent dance form in the set of traditional classical Indian dances. The dance form of Rabindra Nritya is the pure claddical based dance form that was invented and devised by the first noble laureate from Asia, the world renowned Indian poet, Rabindranath Tagore…….The dance form is prevalently famous in the state of west Bengal, to be more Specific in the city of santiniketan in the Birbhum distict…….The main complement of Rabindra Nritya is Rabindranath Tagore are the main musical Support to the dance form or it can be said that Tagore devised the dance form to suit the feel of his songs. The Songs of Tagore are made of Nature, Love for God, Love for lover and personal affair and the dance form is moulded accordingly."*[2]

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথের মনে নৃত্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা যে গুরু হয়েছিল তা প্রাবন্ধিক নেপাল মজুমদার তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' গ্রন্থে জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে কয়েকটি কবিতার বৃত্য রূপদানের চেষ্টা করেছিলেন। কবিতাগুলি হল-'ঝুলন', 'পূজারিনী, 'শিশুতীর্থ', 'দুঃসময়' প্রভৃতি। এওছাড়া এ সময় তেই ঋতু সংগীত ও ঋতু-উৎসব তেও কবি নৃত্যের প্রয়োগ ঘটিয়ে ছিলেন, এরপর 'শাপমোচন', 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা' ও 'চন্ডালিকা' প্রভৃতি তে ও নৃত্যের প্রয়োগ ঘটান।

> *"Sometimes songs are selected from the vast range of Rabindrasangeet and then they are clubbed with the drama by Rabindranath Tagore and is performed as Nritya Natya. The plays 'Rakta karabi,' 'Natir puja,' 'Raja', 'Arupratan;*

'Muktadhare' etc……. The dance forms used are mainly adapted versions of Bharatnatyam, Manipuri and kathakali. The key point of Rabindra Nritya Natya is expressive dancing…… Now a days sometimes odissi, kathak and knchipndi dancing Nritya Natya."

তবে বিষয়বস্তু এবং ভাবসম্পদের দিন থেকে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যগুলি ভারতের বিভিন্ন প্রথাগত নৃত্যের থেকে একে বারেই আলদা। রবীন্দ্রনাথ যেসব নৃত্য সৃষ্টি করেছেন তা একান্তভাভাই রাবীন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। তাঁর এই সমস্ত নৃত্যগুলির মূল লক্ষ্য ছিল শিল্প ও রস সৃষ্টি। যেমন ১৯১৭ সালে, বসন্তোৎসবের সময় দোল পূর্ণিমার দিন 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' অভিনীত হয়েছিল- এই পালাগানে নটরাজ শিবের তাণ্ডব নৃত্য ছিল প্রধান কেন্দ্র বিন্দু। রবীন্দ্রনাথের নটরাজের নৃত্য কল্পনাতে দুটি গান এবং নাচ বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। একটি হল 'নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ যা 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' পালাতে দেখানো হয়েছিল আর অপরটি হল 'প্রলয়নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে হে নটরাজ'-যা ১৯২৯ সালে 'তপতী' নাটকের অভিনয় তে দেখানো হয়েছিল।

আমরা জানি যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতের ঐতিহ্যবাহী ধ্রুপদী এবং লোকনৃত্যের এই দুটি ধারাকে সমান ভাবে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। তাইতো শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের কে মণিপুরী নৃত্য শিক্ষাদানের জন্য ত্রিপুরার রাজসভায় নৃত্যগুরু বুদ্ধিমন্ত সিং কে নিয়ে এসেছিলেন। আবার ১৯২৫ সালে নবকুমার সিং কেও নিয়ে এসেছিলেন এই মণিপুরি নৃত্য শেখানোর জন্য, এরপর ভারতনাট্যম শেখাতে মাদ্রাজ থেকে বাসুদেব এসেছিলেন। আবার কথাকলি নৃত্যের জন্য কবি শান্তিদেব কে কেরলে পাঠিয়ে ছিলেন কবি জল্লাযোল এর কাছে শিক্ষা নিতে। আবার এই শান্তিদেব কে সিংহলে ও পাঠিয়েছিলেন 'ক্যান্তি' নৃত্য শিক্ষার জন্য। কবির 'নবজতেক' গ্রন্থতে এই ক্যান্ডি নৃত্যের পরিচয় আছে 'সিংহলে সেই দেখেছিলাম ক্যান্ডিদলের নাচ/শিকড় গুলোর শিকল ছিঁড়ে যেন শালের গাছ।'

তবে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় নৃতো যে ও জস্বিতা, বীর্য ও পৌরুষের সন্ধান করেছিলেন, তা আমাদের দেশে ধ্রুপদী নৃত্যতে তা ছিল না। এই ও জস্বিতা, বীর্য ও পৌরুষের পরিচয় আছে আমাদের দেশের লুপ্ত- প্রায় লোকনৃত্যগুলিতে। তাই তিনি মনে করেছিলেন যে, লোকনৃত্য থেকে অনেক উপাদান ও কলা কৌশল সংগ্রহ করে ধ্রুপদী নৃত্য এবং আধুনিক নৃত্য আর ও বেশি সমৃদ্ধ হতে পারে। কারণ তিনি জানতেন বাংলার নানা উৎসব অনুষ্ঠানে, বারোমাসে তেরো পার্বণে, কৃষি ভিত্তিক গ্রামীণ জীবনে ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত ও লোক নৃত্যের ধারা প্রাণরস আহোরণ করে বেঁচে আছে। কারণ গ্রামীণ এই সামগ্রিক জনজীবন থেকে কখনও ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত ও লোক নৃত্যকে আলাদা করে বা বিচ্ছিন্ন করে বাচানো যায় না। লোকশিল্প, লোকসংগীত, নৃত্য-নাট্য ইত্যাদি কেবল গ্রামীণ মানুষের নয়- তা দেশ ও জাতির সম্পদ। আর সেই কারণে তিনি ভেবেছিলেন যে, যমগ্র দেশ- জাতি এই ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের জন্য গর্ববোধ করুক। রবীন্দ্রনাথের এই গ্রাম পুর্নগঠনের আদর্শ ও কর্মকাণ্ড এবং 'ব্রতী বালক সঙ্ঘ' জনপ্রিয় ভারতীয় শিল্পী গুরুসদয় দত্ত কে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই রবীন্দ্র নাথের 'ব্রতী বালক সঙ্ঘ' এর আদর্শে ১৯৩২ সালে তিনি মিউড়িতে 'ব্রতচারী সঙ্ঘ' এবং 'ব্রতচারী আন্দোলন' এর প্রবর্তন করেছিলেন। এই ব্রতচারীর মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে গুরুসদয় দত্ত তাঁর 'ব্রতচারী যথা' গ্রন্থে বলেছেন যে, ব্রতচারীর প্রধান লক্ষ্য হবে চরিত্রের দিকে আর শেষ লক্ষ্য হবে নৃত্য। কারণ- নৃত্য না করলে জীবনকে পূর্ণতম করা যায় না। আর তাই ব্রতচারীর বৃত্ত হল- কৃত্য ও নৃত্য - ৬ খেলাধূলা ব্যায়াম ও নৃত্য/ দৈনিক ব্রতচারী –কৃত্য।" গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলনের এমন সাফল্য দেখে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে লিখেছেন, "ব্রতচারী অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ুক, এই কামনা করি। এই ব্রত চর্চা

পালন করলে প্রাণের আনন্দ, কর্মের শক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা লাভ করবে, তাতে সন্দেহ নেই।"এই ভাবে নৃত্য ও গীতের সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের ধারণাটি পরিবর্তন করে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছিলেন যে, নৃত্য ও গীত -যে মন ভোলাবার জন্যে নয়, মন জাগাবার জন্যে।

আমার সবাই জানি রবীন্দ্রনাথ কবি, গীতিকার, সুরকার এমনকি সুগায়ক ও। তাই তার কতগুলো কাব্যগ্রন্থের শিরোনামে সংগীত শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন 'সন্ধ্যা সংগীত', 'প্রভাত সংগীত', 'ছবি ও গান', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' প্রভৃতি। এইসব কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও তাঁর অনেক কাব্যের (যেমন 'উৎসর্গ', 'খেয়া', 'নৈবেদ্য' প্রভৃতি) অনেক ছোট ছোট কবিতা গানের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। যেমন 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম কবিতা ও একটি গান - "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার। চরণধূলার তলে/ সকল অহংকার হে আমার। ডুবাও চোখের জলে।" তাঁর গানের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। 'জীবনস্মৃতি' পড়তে গিয়ে দেখেছি জ্যোতিরিন্দ্রিনাথ পিয়ানো বাজিয়ে সুরসৃষ্টি করতেন আর রবীন্দ্রনাথ কথা দিয়ে গান রচনা করতেন। এছাড়া 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কাল মৃগয়া নাটকের গানে রবীন্দ্রনাথ নিজে সুর দিলেন, বৈষ্ণব পদাবলীর ফর্মে বাঁধলেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' আর পল্লী সংগীত ও কীর্তন গানের সুরে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' থেকে 'কল্পনা' পর্যন্ত রচনাগুলোর একটা ফর্ম তৈরি করে নিলেন। তাঁর সংগীতের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে সমালোচক Dr. Arnold Bake বলেছেন, "Let us briefly….. the three current visible in the poet's music, First western music, second classical Indian music, Third folk music" যাইহোক রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে রয়েছে সুন্দর এক গল্প, চিত্র, আধ্যাত্মিকতা, অনুভব', মানুষের প্র্যাত্যহিক জীবনের কাহিনি। যেমন "যে রাতে মোর দুয়ারগুলি। ভাঙল ঝড়ে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এইসব গানের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে দিলরুবা, বেহালার প্রাধান্য দিতেন কিন্তু হার্মোনিয়াম বাদ্যযন্ত্রের তিনি বিরোধী ছিলেন। তাইতো যখন ১৯৪০ এর মার্চ মাসে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও" তাঁদের সব অনুষ্ঠান থেকে হার্মোনিয়াম বাদ্যযন্ত্রখানি বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন- "Indian Music in All India Radio: Calcutta Welcomes Harmonium Ban"[৬] তখন রবীন্দ্রনাথ এই প্রস্তাব কে সমর্থন করেছিলেন। তাই এ প্রসঙ্গে বলতেই হয় শুধু বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নয়, তাঁর বাদ্যযন্ত্রহীন গানগুলো তাঁকে সংগীতের জগতে অমর করে রেখেছে। যেমন- "মরণে রে তুহু মম শ্যাম সমান", বা "আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' প্রভৃতি। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ গান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তালের কথাও সমান ভাবে ভেবেছিলেন। যেমন এইসব তালে তিনি গান রচনা করেছেন। সেগুলি হল ঠুংরি, আড়াঠেকা, কাশ্মীরি, খেমটা প্রভৃতি। তিনি জানতেন যে, কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাল ও দ্রুত বা বিলম্বিত করাটা খুবই জরুরী। তাই তিনি সবসময় ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলো সাজাতেন। যেমন ব্রহ্মসংগীত হিসেবে গীত "তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা" - গানটি পূজা পর্যায়ের পরিবর্তে প্রেম পর্যায়ে স্থান পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে, উল্লাসের সুর পাশ্চাত্য সংগীতে বেশি, ভারতীয় সংগীতে তা নেই বললেই চলে। পাশ্চাত্য সংগীতের এই উল্লাসের প্রভাব আমার তাঁর 'বাল্মীকি প্রতিভা'তে দেখেছি- "গহনে গহনে যারে তোরা, নিশি বয়ে যায় যে"। ঠাকুর পরিবারে পাশ্চাত্য এই উল্লাসের সুরের প্রচলন তিনি প্রথম করেছিলেন তাঁর একটি গানে- "তোমার হল শুরু, আমার হল সারা"। এছাড়া ইংরেজি গানের সুরে তিনি কয়েকটি গান বেঁধেছিলেন- যেমন "পুরানো সেই দিনের কথা," "ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে" প্রভৃতি। এই ইংরেজি গানের সঙ্গে আমাদের গানের একটা

প্রভেদ আছে। আর এই প্রভেদ বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ইংরেজি সংগীত লোকালয়ের সংগীত আর আমাদের সংগীত প্রকাণ্ড নির্জন প্রকৃতির অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয় বিষাদের সংগীত।"[৭] কারণ স্বরূপ তিনি আরও বলেছেন, "আমাদের দেশে সংগীতে রোদনের সুরের অভাব নাই। সকল রাগিনীতেই প্রায় কাঁদা যায়"[৮] রবীন্দ্রনাথ শুধু ইংরেজি সংগীত ও ভারতীয় সংগীতের সমালোচনা করেননি, তিনি নিজের গানের ও সমালোচনা করেছেন। দিলীপকুমার রায়কে লেখা একটা চিঠিতে তিনি বলেছেন " 'জনগণ' গান যখন লিখেছিলেম তখন 'মারাঠা' বানান করিনি। মারাঠিরাও প্রথম বর্ণের আকার দেয় না। আমার ছিল 'মারাঠা'। তারপরে যাঁরা শোধন করেছেন তাঁরাই নিরাকারকে সাকার করে তুলেছেন, আমার চোখে পড়েনি।" যাইহোক কবি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সুরেও অনেক গান রচনা করেছেন। যেমন মহাশূরী ভজনের সুরে- "একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে" বা কর্ণাটকী গানের সুরে "বড়ো আশা করে এসেছিনু গো কাছে ডেকে লও" প্রভৃতি। এছাড়া বাউল, ভাটিয়ালি, সারি, কীর্তন প্রভৃতি সুরেও তিনি অনেক গান রচনা করেছেন। যেমন 'গোরা' উপন্যাসে আমরা একটা বাউল গান পাচ্ছি- "খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়/ ধরতে পারলে মনো বেড়ি দিতেম পাখির পায়।" এছাড়াও তাঁর কয়েকটি বাউল গান আমরা পেয়েছি। যেমন "আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে/ তাই হেরি তায় সকল খানে।" আর এই বাউলের নেশায় রাঢ় বাংলার রাঙা পথে কোন অদৃশ্য ইঙ্গিতে কবি যেন কোন্ নিরুদ্দেশ যাত্রায় উদ্দেশ্যে চলেছেন তা বুঝি তিনি নিজেও বুঝতে পারেননি। তাইতো বাউলের নেশায় পাগল হয়ে সারিগানের সুরে, কাহার বা তালে রচনা করলেন- "গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ/ আমার মন ভুলায় রে।" তিনি চেয়েছিলেন জেলে যেখানে মাছ ধরছে, মাঝি যেখানে খেয়া দিচ্ছে, তাঁতী যেখানে তাঁত বুনছে, চাষী যেখানে চাষ করছে সেখানে তাঁর গান পৌঁছে দিতে। তাইতো দরবারি সুর বর্জন করে এইসব গ্রাম্য সংগীতের সুরে তিনি গান বাঁধলেন। যেমন- "বাংলার মাটি, বাংলার জল", "ও আমার দেশের মাটি", "আমার সোনার বাংলা" প্রভৃতি। যাইহোক রবীন্দ্রনাথের এইসব সর্বজনীন গানগুলো বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইংরেজি তর্জমা করাটা খুবই জরুরি। এ বিষয়ে যদিও কবির স্নেহ ধন্য সুধাময়ী দেবীর কৃতিত্ব অতুলনীয়। তিনি তাঁর 'Some Songs of Rabindranath Tagore' গ্রন্থে রবীন্দ্র সংগীতের অনেক ইংরেজি তর্জমা প্রকাশ করেছিলেন। যেমন "তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে", "আজি বরিষণ মুখরিত শ্রবণ রাতি", "আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে", "দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়" প্রভৃতি।

আমরা সবাই জানি যে, ভারতীয় সাহিত্য সাধনাতে আধ্যাত্মিকতার একটা যোগ আছে। তাই বিদেশি সাহিত্যের তুলনায় ভারতীয় সাহিত্য যে বেশি পরিমাণে রূপকাশ্রিত হবে এটাই স্বাভাবিক। বিশেষ অরে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবনার প্রকাশ তাঁর গানের মধ্যে বেশি করে পরিলক্ষিত হওয়ায় রূপকের ব্যবহার ও তাঁর গানে বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়ার অবকাশ পেয়েছে। তাঁর অধ্যাত্মভাবনাতে দেখেছি যে একদিক থেকে জীবন দেবতা অভিসারে এগিয়ে আসছে, অপরদিক থেকে অন্তর্যামী বরণডালা ও বরণমালা নিয়ে স্বয়ং বরে এগিয়ে আসছে। কবি সত্ত্বার মধ্যে এইভাবে ego ও Super-ego একসঙ্গে কাজ করে চলেছে। তাই তো রবীন্দ্র রচনায় সব সিম্বল্ই জোড়া জোড়া। যেমন – চলাঃ বসা, স্রোত: পথ, বাহির: অন্তর, বাঁশি: বীণা, আগুন: প্রদীপ, হাট: ঘাট প্রভৃতি। এখানে তাঁর কয়েকটি বিশিষ্ট রূপক শব্দের আলোচনা করছি। যেমন- 'আগুন: প্রদীপ'- 'আগুন' সাধারণত তাঁর রচনাতে দুঃখ দহনের ভস্মনির্বাণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। "জ্বলতে দে তোর আগুনটারে, ভয় কিছু না করিস তারে।" আর অপরদিকে 'প্রদীপ' দুঃখ দহনের মঙ্গল আলোকের রূপক হিসেবে তাঁর রচনাতে স্থান পেয়েছে- "আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন। আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।" আবার 'ছুটি' তাঁর রচনাতে

সংসারের ভালোমন্দের দায় থেকে মুক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন তাঁর 'শারদোৎসব' নাটকের প্রথম দৃশ্যের শুরুতে বালকদের গানে এই ছুটি শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে- "মেঘের কোলে রোদ হেসেছে,/ বাদল গেছে ছুটি/ আজ আমাদের ছুটি ও ভাই/ আজ আমাদের ছুটি।"

রবীন্দ্রনাথের রচনার বিভিন্ন শাখায় যেমন নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাসে গানের ব্যবহার দেখা যায়। শুধু গানের ব্যবহার নয়, রচনাশৈলীর মধ্যেও কোথাও কোথাও গানের ভাব ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর বেশিরভাগ নাটকে গানের ব্যবহার করেছেন। আবার অনেক নাটক তো গীতিনাট্যেরই পর্যায়ভুক্ত। বিশেষ করে 'মায়ার খেলা' নাটকটি তো একটি সুবিখ্যাত গীতিনাট্য। 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' নাটকে যেমন আমরা 'গানের সূত্রে নাট্যের মালা' দেখেছি তেমনিভাবে 'মায়ার খেলা' নাটকটি যেন 'নাট্যের সূত্রে গানের মালা'। এই নাটকের কয়েকটি খুব জনপ্রিয় গান হল- "আমার পরাণ যাহা চায়,/ তুমি তাই, তুমি তাই গো!/ তোমা ছাড়া আর এ জগতে/ মোর কেহ নাই কিছু নাই গো?", "দিবস রজনী, আমি যেন কার/ আশায় আশায় থাকি", "এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,/ শুধু সুখ চলে যায়-/ তেমনি মায়ার ছলনা।" আবার 'গোড়ায় গলদ' নাটকের শেষে একটি বাউল গান আছে। এই গানটির একটি বিশেষত্ব হল এই যে- কবির লেখা ও সুর দেওয়া প্রথম সুস্পষ্ট একটি বাউল গান- "যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক তোমার সবাই ভাল।/ আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালো।" রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের অনেক গল্পের মধ্যে যেমন 'মধ্যবর্তিনী', 'আপদ', 'মানভঞ্জন' প্রভৃতি গল্পে গানের ভাব ও বর্ণনা আছে। আবার 'মেঘ ও রৌদ্র', 'খাতা' গল্পে তো প্রত্যক্ষভাবে গানের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে- "এসো এসো ফিরে এসো- নাথ হে, ফিরে এসো?" এছাড়া 'লিপিকা'র গল্পগুলো তো গানের সুরে গাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ নিজে একথা বলেছিলেন। যেমন- 'মেঘদূত' গল্পের কয়েকটি লাইন গানের মত বেজে ওঠে- "এক একদিন জ্যোৎস্না রাত্রে হাওয়া দেয়; বিছানার পরে জেগে বসে বুক ব্যথিয়ে ওঠে; মনে পড়ে, এই পাশের লোকটিকে তো হারিয়েছি। ..... সে তো সংসারের হাজার লোকের মধ্যে একজন; তাকে তো জানা হয়েছে, চেনা হয়েছে, সে তো ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু ওর মধ্যে কোথাও সেই আমার অফুরান একজন, সেই আমার একটি মাত্র।"[১০] বা 'একটি চাউনি' গল্পে দেখি- "গাড়িতে ওঠবার সময় একটুখানি মুখ ফিরিয়ে সে আমাকে তার শেষ চাউনিটি দিয়ে গেছে। এই মস্ত সংসারে এটুকুকে আমি রাখি কোনখানে।"[১১] এই 'লিপিকা'র গল্পগুলোর মতো গল্পগুচ্ছের 'রাজপথের কথা' ও 'ঘাটের কথা' গল্প দুটি তো গানের মতোই বেজে ওঠে। যেমন রাজপথের কথা গানের মত বাজে কি না দেখা যাক- "গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশা পথ চাহিয়া থাকে। কিন্তু পথ প্রতি বর্তমান নিমেষের শত সহস্র নূতন অভ্যাগতকে লইয়াই ব্যস্ত। ... আমি কিছু পড়িয়া থাকিতে দিই না, হাসি ও না, কান্না ও না। আমি কেবল পড়িয়া আছি।" উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'গোরা' তে যে একটি গান ব্যবহার করা হয়েছে তা আগেই বলেছি। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কিন্তু সাংগীতিক একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসের নায়িকা কুমু অতৃপ্ত বাসনার, 'ব্যথিত যৌবনা রূপসী' এবং একজন প্রতিবাদী যুবতী। নারী জীবনের অনেক বঞ্চণা যে সহ্য করেছে। তবে সে এমন সহিষ্ণু হলেও কিন্তু অভিমানী। তার অন্তর ভরপুর হয়ে আছে সংগীতের মোহিনী সুরে- "ওর মন সুরে ভরপুর, সংসারে কে ওর' পরে কী অন্যায় করেছে যে সমস্ত তুচ্ছ হয়ে গেছে।"[১২] তাই অভিমানী কুমুর "মেরে গিরিধর গোপাল"- এই মনের গান তার চোখের জলের ঝর্ণাধারা রূপে বেরিয়ে আসল- "কখন তার গলায় ফুটে উঠল তা টেরই পেলে না- দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।"[১৩] অপরদিকে 'চতুরঙ্গ', 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে কবি সংগীতের এক বিচিত্র দিক উন্মোচন করেদি্যেছেন। যেমন- 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের শেষের অংশটি

একটু ভাবা যাক "যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারে ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।"[১৪] সেইসঙ্গে 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের শেষে লাবণ্যর লেখা চিঠির এক পাতে আমরা দেখি শোভন লালের সঙ্গে লাবণ্যের বিবাহের খবর। আর অপর পাতে প্রেমিক অমিতের উদ্দেশ্য কী লিখেছে তা একবার পড়ে নিয়ে সংগীতের সমুদ্রে সাঁতার দেওয়া যাক। চিঠির প্রথম অংশে দেখি- "কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও।/ তারি রথ নিত্যি উধাও/ জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয় স্পন্দন,/ চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষ ফাটা তারা ক্রন্দন।"[১৫] আর শেষ অংশে- "ওগো তুমি নিরুপম,/ হে ঐশ্বর্যবান/ তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান। গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়/ হে বন্ধু বিদায়।"[১৬]

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা যেমন গানের আকার নিয়েছে তেমনি কোন কোন গান আবার কবিতা হিসাবেও খুব ভালো। যেমন 'গীতালি' কাব্যের ৬৫ সংখ্যক রচনাটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে- "মেঘ বলেছে; 'যাব যাব'/ রাত বলেছে, 'যাই';/ সাগর বলে, 'কূল মিলেছে/ আমি তো আর নাই।' .... প্রেম বলে যে, 'যুগে যুগে/ তোমার লাগি আছি জেগে'/ মরণ বলে, 'আমি তোমার জীবন তরী বাই।" এমনকি রবীন্দ্র সংগীত বাংলা চলচ্চিত্রেও খুব ভাল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে, অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের 'আলো চলচিত্রটি। যে চলচিত্রটি রবীন্দ্র সংগীতে সমৃদ্ধ। যেমন- "শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে/ তোমারি সুরটি আমার মুখের পরে বুকের পরে।" বা "দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার/ গানের ওপারে,/ আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি/ পাইনে তোমারে" প্রভৃতি। এছাড়াও চলচ্চিত্রটির শুরুতে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার কয়েকটি লাইন ও গীতের আকারে পরিবেশন করা হয়েছে। যেমন "নমোনমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।/ গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।" বা "বুকভরা মধু জল লয়ে যায় ঘরে,/ মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখ আসে জল ভ'রে।" রবীন্দ্র সংগীত ছাড়া এই চলচ্চিত্রটি কেমন হত তা আমরা ভাবতেও পারি না। তাইতো রবীন্দ্র সংগীতের সেই ব্যাপকতা, ঐতিহ্য, মাধুর্য এখনও সগৌরবে চলছে এমন অত্যাধুনিক গানের প্রতিযোগিতার যুগেও। এমনকি "আজি হতে শতবর্ষ পরে", শুধু শতবর্ষই বা বলি কেন, হাজার হাজার বছর ধরেও রবীন্দ্র সংগীতের এমন জনপ্রিয়তা ও জয় জয়োকার আটুট থাকবে আশা করা যায়- "ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়। তোমারি হউক জয়..... প্রভাত সূর্য, এসেছে রুদ্রসাজে, / অরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে/ মৃত্যুর হোক লয়।/ তোমারি হউক জয়।" কিন্তু একটা দুঃখের বিষয় হল এই যে, আজকাল রবীন্দ্র সংগীতের Remix প্রচুর পরিমাণে বাজারে চলছে। তাতে রবীন্দ্র সংগীতের যে ভাব, মাধুর্য, ঐতিহ্য সবটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া তাঁর গান সাধারণ মানুষের একান্তে ঘরে বসে গাইবার গান, বেঁচে থাকার গান- তা বাইরে হাত তালি পাওয়ার জন্য নয়। তাইতো কবি বলেছেন, "গান ঘরের মধ্যে মাধুরি পাওয়ার জন্য, বাইরের হাততালি পাওয়ার জন্যে নয়।"[১৭] তাছাড়া তাঁর গান ঘাত-প্রতিঘাতের গান, 'হিয়ার মাঝে লুকিয়ে' রাখার গান, বিপদে সম্পদে প্রাণিত করে পথ দেখানোর গান- "বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা/ বিপদে আমি না যেন করি ভয়।" তাইতো মানব প্রেমী কবি তথা সর্বজনের কবি রবীন্দ্রনাথ সর্বজনের মনের মাঝে মুক্তি খুঁজে পেয়েছেন- "যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে/ বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে... তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।/ সকল খেলার করবে খেলা এই আমি।/ নতুন নামে ডাকবে মোরে,/ বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে/ আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।" এ শুধু কবির আসা যাওয়ার লীলা বা মুক্তি নয় এ যেন তাঁর সংগীতের ও যুগান্তর কাল ধরে আসা যাওয়ার লীলা ও মুক্তি। তাইতো –

"তুমি নব রূপে এসো প্রাণে,/ এসো গন্ধে বরনে এসো গানে।।" আর আমরা মুক্তি খুঁজে পাই রবীন্দ্র সংগীতের 'আলোকেরই ঝর্ণা' ধারার 'তা তা থৈ থৈ' নৃত্যের ছোঁয়াতে। তাই "চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে/ নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে... তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে। বরণের মালা পরায়ে।"

তথ্য সূত্র:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; সংগীত ও ভাব; বেথুন সোসাইটির আয়োজনে, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হলে বক্তৃতা, ১৯ শে এপ্রিল, ১৮৮১

২. www. gosahin.com-Rabindra Nritya Natya

৩. Rabindra Nritya Natya- wikipedia, en.m. Wikipedia. org>wiki>Rabindranath

৪.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; গুরুসদয় দত্তকে লেখা পত্র, ১৩৮১.২৫ শে আষাঢ়

৫. Dr. Arnold Bake; Tagore as a composer, Modern Review- April 1932. Page- 424-27

৬. Times of India, April 3, 1940

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; য়ুরোপ যাত্রীর ডায়রি; সংগীত চিন্তা, ১৬ অক্টোবর, ১৮৯০, পৃ- ২০৮

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; দিলীপ কুমার রায়কে লেখা চিঠি, ১৯২৯, ১০ই নভেম্বর

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র গল্প সমগ্র; রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা, ২০০২,পৃ-৫২৬

১১. তদেব, পৃ- ৫২৬

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী ; পঞ্চম খণ্ড, যোগাযোগ , বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ-৩৫৭

১৩. তদেব, পৃ- ৩৫৭

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী; চতুরঙ্গ চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ-৪৫৭

১৫. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, শেষের কবিতা, পৃ- ৫২৩

১৬. তদেব, পৃ- ৫২৫

১৭. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১লা জুলাই, ১৯৪০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. সুনীলময় ঘোষ; রবীন্দ্রখনন চর্চা; রবীন্দ্র-সংগীত, অভিনব প্রকাশনী, কলকাতা ৭৩, ১৪১৭

২. সুকুমার সেন; বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস; চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ১৯৫৩

৩. কিরণ শশী দে; রবীন্দ্র সংগীত; শিক্ষক দিনেন্দ্রনাথ; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ১৯৮১

৪. সুশীল কুমার ঘোষ; রবীন্দ্র গানের অন্তর্জগৎ ; টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা-২৬, ১৮১৬

৫. সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর; রবীন্দ্রনাথের গান; বৈতানিক প্রকাশনী, কলকাতা-২০, ১৩৬৮

৬. নেপালে মজুমদার; রবীন্দ্রনাথ; শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি প্রসঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ১৪০৬